বিজয়ের ৫৪ বছর

১৬ই ডিসেম্বর
মহান বিজয় দিবস
২০২৫

◆ বিশেষ ক্রোড়পত্র ◆ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০১ পৌষ ১৪৩২
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। এ দিনটি আমাদের জাতীয় গৌরবের প্রতীক, স্বাধীনতার চূড়ান্ত সাফল্যের স্মারক। বিজয়ের আনন্দঘন এ দিনে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই বিজয়ের শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

স্বাধীনতা আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন, যার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ শোষণ, বঞ্চনা ও সংগ্রামের ইতিহাস। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে আমরা অর্জন করি কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। বিজয়ের এই দিনে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে অত্মোৎসর্গকারী সকল বীর শহিদ, যুদ্ধাহতসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা, সম্ভ্রমহারা মা-বোন, শহিদ পরিবারের সদস্য ও আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান রাখা সকল সংগ্রামী যোদ্ধাদের, যাঁদের ত্যাগ ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ ছিল না, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বিগত পাঁচ দশকের পথচলায় জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক মুক্তি এখনো অর্জিত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে নতুন আশা জাগিয়েছে।

স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং ঐক্যের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলে একযোগে কাজ করব- এটাই হোক মহান বিজয় দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মুক্তিযুদ্ধের গল্প ও বাংলাদেশের জনসমাজ

মোহাম্মদ আজম

অনেকেই বলেন, মানুষ বেঁচে থাকে গল্পে। গল্পেই তার বসতি। তার স্থিতি। অতীত। ভবিষ্যৎ। কথাটা আরেকটু চালুভাবে ভাষার ক্ষেত্রে বলা হয়। অনেক জ্ঞানীজন বলেছেন, ভাষাই মানুষের বসতি। মানুষের অস্তিত্ব। এ কথার দার্শনিক ও অস্তিত্ববাদী নানা তাৎপর্য আছে নিশ্চয়ই। তবে সরল করে বলা যাবে, ভাষায় জমে ওঠা এবং রূপ পাওয়া রসদই শেষ পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্বের মূল আশ্রয় হয়ে ওঠে। গল্পই এ রসদগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অথবা বলা যায়, গল্পের আদলে জমে ওঠা সূক্ষ্ম উপাদানগুলোই ওই রসদের সর্বোত্তম জোগানদার।

এ প্রসঙ্গে আমরা আদি মানুষ সম্পর্কিত এক অনুমানের উল্লেখ করতে পারি। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, হোমো স্যাপিয়েন্সের মতো সমধর্মী আরও একাধিক প্রজাতি বিকশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে টিকে গেছে কেবল একটি প্রজাতি। কীভাবে? বিস্তর রক্তক্ষয়ী লড়াই-সংগ্রাম নিশ্চয়ই হয়েছে। তবে লড়াইয়ে যে হোমো স্যাপিয়েন্স এতটা সুবিধা করতে পারল, তার কারণ কী? মনে করা হয়, এর অন্যতম প্রধান কারণ গল্প। নিজেদের পারস্পরিক, সামষ্টিক ও অস্তিত্ব-সংক্রান্ত গল্প জমে ওঠার জোরেই নাকি হোমো স্যাপিয়েন্স জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। বাদবাকি নানারকম আকস্মিকতা আর প্রকৃতির আনুকূল্য তো ছিলই।

গল্প কী করে? তার এত বড়ো ভূমিকা কোত্থেকে আসে? গল্পের সবচেয়ে বড়ো কাজ ব্যক্তিদের পারস্পরিকতা তৈরি করা। ব্যক্তিমানুষের যে অগণিত আলাদা আলাদা বিশিষ্টতা থাকে, গল্প তার ধার-ভার কমিয়ে ক্রমশ একটা গড় তৈরি করে। প্রস্তাব করে কাঠামো। গল্পের মধ্যে উপস্থাপিত হয় জীবনের প্রতিরূপ। মানুষ একজন আরেকজনকে দেখে। কতটুকুই বা আর দেখে। বিশাল জনগোষ্ঠীর অনেকখানিই তার রয়ে যায় আওতার বাইরে। কিন্তু গল্প হাজির করে এমনসব চরিত্র, যারা বহু মানুষের প্রতিনিধি হয়ে শ্রোতার মনে ক্রমশ গড় মানুষের ধারণা তৈরি করে। এর মধ্য দিয়ে তৈরি হতে থাকে তার নিজের আকার ও পরিসীমা। গল্প তো নিজেই একটা কাঠামো। তার মধ্যে প্রাকৃতিক আর মনুষ্যনির্মিত অবকাঠামো থাকে। থাকে সামষ্টিক মানুষ। সামষ্টিক মানুষের বিচিত্র গঠন আর সংঘটনের মধ্যে গল্পের ব্যক্তিরা সমষ্টির অংশ হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে ক্রিয়া করে। সামষ্টিক কাঠামোর এই মনোহর গড়নের মধ্যেই মানুষ নিজেকে দেখতে পায়। নিজের চারপাশকে দেখে। সম্পৃক্ত আর সম্পর্কিত হয় অপরের সাথে।

কিন্তু এটুকুতেই শেষ নয়। যেসব অনুভূতি আর উপলব্ধির বিচিত্র মিশেলে, অসংখ্য জটিল বিন্যাস-সমাবেশে গল্পের গাঁথুনি তৈরি হয়, সেগুলোও সমধর্মী অনুভূতি বা উপলব্ধির ধারণা তৈরি করতে থাকে। মানুষ নিজের মধ্যে সুপ্ত ও লিপ্ত অনুরূপ ধারণা সম্পর্কে সচেতন হয় এভাবে। একইসাথে দশের সাথে একাত্ম হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেও প্রবেশ করে। আর অভিজ্ঞতার জগৎ তো আছেই। শুধু কথায় বা শুধু কাজে মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় সত্য; কিন্তু তা আর কতদূর বিস্তৃত হতে পারে। একজন ব্যক্তিই বা নিজের অভিজ্ঞতার সীমানাকে কতদূর বাড়াতে পারে? ঘটনা বা ক্রিয়া, সে ব্যক্তি-মানুষেরই হোক আর সমষ্টির নিজের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে যেমন চলে যেতে পারে অনেকদূর, স্থানের মতো কালের সীমানাকেও ফেলতে পারে পেছনে, যদি তা পরে গল্পের বেশ। যদি কাহিনির বরাভয়ে অভিজ্ঞতার ছোট-বড়ো দলগুলো পাখা মেলে যেতে পারে সুদূরের পানে, তাহলেই কেবল একের অভিজ্ঞতা দশকে সঙ্গী করে সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়।

কিন্তু এখানেও আসলে শেষ নয়। গল্পের আসল কেরামতি শুরু হয় এর পরের ধাপে। গল্পের কথারা এক মুখ থেকে অন্য মুখে নিত্য ভ্রমণ করে। যোগ করে। বিয়োগের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যায়। গল্পের আকার জটিল হতে থাকে। স্থান আর কালের সীমানা ভেঙেচুরে হয়ে ওঠে বহুপল্লবিত অভিজ্ঞতার আধার। জন্ম নেয় মিথ। মিথের গড়নের মধ্যে বহু মানুষ নিজের নিজের মতো খুঁজে নেয় দশের সাথে সমন্বিত হওয়ার রসদ। এ ধরনের একটা আবহের মধ্যেই গড়ে ওঠে জনসমাজ। পরস্পর-সম্পর্কিত মানুষের এক-একটা জোট, যারা নিজেদের কোনো-না-কোনো মাত্রায় একরকম বলে মনে করতে থাকে।

আধুনিক মানুষের জীবন নতুন ধরনের গল্প আর নতুন মিথেরা নিত্যনতুন রূপে এমনভাবে অধিকার করে থাকে যে, মনে হয় আমরা বুঝি গল্পের জগৎ ছেড়ে এসেছি। আমাদের ব্যক্তির গড়নে আর সামষ্টিক অস্তিত্বের সংজ্ঞায়নে গল্পের আর তেমন কোনো ভূমিকা নাই। কিন্তু বাস্তবতা মোটেই তা নয়। মানুষ যে নিজেদের জাতি নামে চিনতে আর পরিচয় দিতে শুরু করেছে, তা বেশিদিন আগের কথা নয়। বহু তাত্ত্বিক তর্কাতীতভাবে দেখিয়েছেন, ধর্মগ্রন্থের গল্প, পত্রিকার গল্প, আর বিশেষভাবে উপন্যাসের গল্প অন্তত পশ্চিমা জাতিরাষ্ট্রগুলোর গড়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন, পুরনো মিথের জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার গরিমার মধ্যে আসলে মানুষ বসতি করছে একরাশ নতুন মিথের শাসনের মধ্যে। গল্পের শাসন থেকে মানুষের মুক্তি নাই।

বাংলাদেশের মানুষ তাদের সামষ্টিক জীবনের দীর্ঘ ইতিহাসে, বলা উচিত জানা ইতিহাসে, সবচেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধের কালে। সময়টি হয়ত খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু খুবই জমাটবদ্ধ হয়ে তুলনামূলক ছোটো সময় দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জোগান দিয়েছে। যে ভূখণ্ডের মধ্যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, যে জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে ঘটনাজাল আবর্তিত হয়েছে, তার একটা অটুট নির্দিষ্টতা ছিল। আজও আমরা স্থান ও জনগোষ্ঠীর যে নির্দিষ্টতার মধ্যে জীবনযাপন করি, তার মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল এসব মর্মভেদী অভিজ্ঞতা।

এসব অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা বিস্তর ইতিহাস লিখেছি। দুনিয়ার ইতিহাসশাস্ত্রের চর্চা যেসব মুনশিয়ানার মধ্য দিয়ে গেছে, তা হয়ত আমরা ছুঁতে পারিনি। কিন্তু ইতিহাস লিখেছি। ইতিহাস, সে চোস্ত ইতিহাস হোক, আর আমাদের মতো তুলনামূলক দুর্বল ইতিহাস হোক, তার একটা জনবিচ্ছিন্ন একাডেমিক প্রবাহ থাকে। ধাত থাকে। তাতে অনেকসময় জনসমাজের অভিজ্ঞতাটা ঠিকঠাক ধরা পড়ে না। অনেকসময় ইতিহাস তো রীতিমতো জনবিরোধীও হয়ে ওঠে। কিন্তু যেরকমই হোক না কেন, জনসমাজে প্রচলিত আর যাপিত জীবনে রূপ পাওয়া গল্পের সাথে তার কোনো তুলনা হয় না। জনমানুষের গল্পে নানা ডালপালা জন্মায়। একের মধ্যে আরেক ঢুকে পড়ে। প্রায়শই গুজব আর প্রপাগান্ডা সেসব গল্পের তুলনামূলক নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হয়। দশের গল্পের মধ্যে সুবিধাজনকভাবে অংশ নিতে থাকে ব্যক্তিগণ।

মুক্তিযুদ্ধ ব্যক্তিগণের জন্য কী ভীষণ অভিজ্ঞতা! একাংশ আছে সম্মুখ সমরে। জীবনবাজি রেখে ছুটছে প্রান্তর থেকে প্রান্তরে। মরার কিংবা মারার এক অন্তহীন আকাঙ্ক্ষায়। অন্য অংশ দেশে কিংবা বিদেশে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে সমগ্র কাহিনির একটা বড়ো অংশ দেখতে পাচ্ছে। হয়ত খানিকটা

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

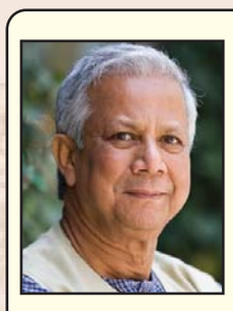

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ পৌষ ১৪৩২
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর, আমাদের মহান বিজয় দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিন। ১৯৭১ সালে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে এই দিনে আমরা পাই কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের স্বাদ। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা আর লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে পাই একটি স্বাধীন জাতিসত্তা আর এই লাল-সবুজের পতাকা। এই দিনে আমি দেশে ও বিশ্বজুড়ে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই বিজয়ের উষ্ণ শুভেচ্ছা।

আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামে যারা আত্মত্যাগ করেছেন, সে সব বীর শহিদদের। তাদের এই আত্মদান আমাদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা ও সাহস যোগায়, সকল সংকটে-সংগ্রামে দেখায় মুক্তির পথ।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে নতুন সূর্য উদিত হয়েছিল, বিগত বছরগুলোতে তা বারবার স্বৈরাচার আর অপশাসনে ম্লান হয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা আবারো একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারমুক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছি। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি উন্নত ও সুশাসিত বাংলাদেশের শক্তিশালী ভিত গড়ে তুলতে যে বিস্তৃত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, দেশের আপামর জনগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আজ আমরা সেই কর্মযজ্ঞের সফল পরিসমাপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি আশা করি, এর মাধ্যমে আগামীর বাংলাদেশে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত হয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির পাশাপাশি নিশ্চিত হবে জনমুখী ও টেকসই উন্নয়ন।

এবারের বিজয় দিবস হোক জাতীয় জীবনে নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে যে নবযাত্রা সূচিত হয়েছে তা যে কোনো মূল্যে রক্ষার শপথ নেওয়ার দিন।

আসুন, বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দিতে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুখী ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলে মিলে হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাই শান্তি এবং সমৃদ্ধির পথে।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বিজয় দিবসের প্রেরণা

অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর। বিকেল চারটা ৩১। রেসকোর্সের সবুজ উদ্যান। পাকিস্তানি ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি তার কাঁধ থেকে সেনাধিনায়কদের সম্মানসূচক অ্যাপলেট খুলে ফেলল। ল্যানিয়াডসহ পয়েন্ট ৩৮ রিভলবারটি ন্যস্ত করল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি ইন চিফ জগজিৎ সিং অরোরার হাতে। নিয়াজির চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু ফোঁটা অশ্রু। রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত মুক্তিকামী বাঙালি জনতা ফেটে পড়ল আনন্দোল্লাসে। নিয়াজির নেতৃত্বে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনার আত্মসমর্পণ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালির বিজয় ঘোষণা করল। এদেশের ইতিহাসে যুক্ত হলো একটি সোনালি অধ্যায়। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সকাল থেকেই ঢাকার সড়কগুলো চলে গিয়েছিল জনতার দখলে। সকাল সাড়ে ১০টার পর সাভার-মিরপুর সড়ক দিয়ে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী জনতার বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ঢাকায়। পথে পথে মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ তাদের স্বাগত জানায়। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সে ছিল এক সোনাঝরা দিন। ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মাহুতির বিনিময়ে বাংলার আকাশে উড়ল বিজয়ের সূর্য। অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু বিজয়ের সেই গর্ব ও আনন্দ এখনও অম্লান।

যেকোনো বিচারেই এক ব্যতিক্রমী জনযুদ্ধ বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। সাত কোটি মানুষের বঞ্চনার জ্বালা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মিলেছিল স্বাধীনতার সরণিতে। বৃটিশদের ১৯০ বছর ও পাকিস্তানিদের ২৪ বছরের দুঃশাসনের দীর্ঘ অধ্যায় শেষে এ দেশের মানুষ বুঝে নিয়েছিল নিজের অধিকারের স্বীকৃতি। বিজয়ের সে মাহেন্দ্রক্ষণ বিনা আয়াসে আসেনি। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বলদর্পী ঘোষণার পর ছাত্র জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত 'না-না' ধ্বনির মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছিল প্রতিবাদের ধারা। আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামের সূচনাবিন্দুও ছিল সেটি। এদেশের মানুষ পরম সাহসে জানিয়েছিল, শোষকের রক্তচক্ষুকে তারা ভয় পায় না। সেই থেকে বাহান্নর মহান ভাষা আন্দোলন আর স্বায়ত্তশাসনের দীর্ঘ আন্দোলনের পথ বেয়ে মুক্তি সংগ্রামের সূচনা ঘটেছিল। পাকিস্তানিদের কাছে বাংলাদেশের মানুষ ছিল দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন এক জাতি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে সেই 'দুর্বল' আর 'ক্ষমতাহীন' মানুষই পরিচয় দিল প্রবাদপ্রতিম বীরত্বের, যে বীরত্বের গল্প লেখা হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। যার সূত্র ধরেই এসেছিল ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের সোনালি মুহূর্ত।

রোমান লেখক পাবলিসিয়াস সাইরাস বলেছেন, একতা থাকলে বিজয় আসবেই (where there is unity there is always victory.)। বাঙালির এ বিজয় তাদের ঐক্যেরই ফল। পাকিস্তানিরা বারবার চেষ্টা করেছে ঐক্যবদ্ধ এই প্রতিরোধকে ভাঙতে। ২৫ মার্চের কালরাতে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে চেষ্টা করেছিল প্রথম ধাক্কাতেই এদেশে মানুষের মনোবলকে গুঁড়িয়ে দিতে। অকাতরে অজস্র মানুষকে হত্যা করে, একের পর এক জনপদকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, সুজলা সুফলা এই দেশকে শ্মশানে পরিণত করার মাধ্যমে এদেশের মানুষকে পরাভব মানাতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি তারা। কিন্তু

এদেশের মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে চিরজাগরুক স্বাধীনতার চেতনাকে বুঝতে ভুল করেছিল তারা। তারা ভুলে গিয়েছিল, এদেশেরই এক সূর্যসন্তান সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় উজ্জীবিত এদেশের মানুষ:

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।
'হয় ধান নয় প্রাণ' এ শব্দে
সারা দেশ দিশেহারা
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।

একাত্তরের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের রয়েছে এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের দুঃশাসনে পদ্ধতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল এদেশের মানুষ। এদেশের মানুষের শ্রমলব্ধ সম্পদ পাচার করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রতিবছর এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০০ কোটি রুপি। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রপ্তানি আয় দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পণ্য আমদানি করা হতো। এদেশে কল-কারখানাসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ১৯৬৫-র ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তকে রাখা হয়েছিল অরক্ষিত, যেন পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নের মালমশলা জোগানোই পূর্বাঞ্চলের একমাত্র কাজ। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হতো না। এদেশের মানুষের মনে দানা বেঁধে ওঠা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়েছে বছরের পর বছর। পর্বতপ্রমাণ এ বৈষম্যই তৈরি করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ। তৈরি করেছে এমন এক মোহনা যাতে সাড়ে সাত কোটি চাওয়া একটি অভিন্ন বিন্দুতে এসে মিলেছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের সকল সংগ্রাম ক্রমশ সেই মোহনার দিকেই ধাবিত হয়েছে। ১৯৭১-এর অগ্নিঝরা নয় মাসে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, এদেশের প্রতিটি ইঞ্চিতে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলেছিল বাংলার মুক্তিকামী মানুষ। যে কিশোর কখনও নিজ গ্রামের চৌহদ্দি পার হয়নি, মাকে ঘুমন্ত রেখে সে কিশোরই চলে গিয়েছিল যুদ্ধে। অগণিত মুক্তিযোদ্ধার কেউ কেউ ফিরেছে, কেউ চিরদিনের জন্য বাংলার সবুজ পতাকায় লাল সূর্য হয়ে মিশে গেছে। নয় মাসের জনযুদ্ধ আর ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবস তাই কারো একার অর্জন নয়। এতে হিস্যা আছে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের। কৃষক, মজুর, ছাত্র, চাকরিজীবী, নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার। সমতলবাসী ও পাহাড়ি, প্রত্যেকের।

যেকোনো বিচারেই আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ছিল এক সত্যিকারের জনযুদ্ধ। কতিপয় স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার ছাড়া বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল এ যুদ্ধে। যে তরুণ অস্ত্র হাতে যুদ্ধে গিয়েছিল তার তুলনায় কোনো অংশে কম ছিল না সেই পল্লি রমণীর অবদান, যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন বা তাদের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিয়েছেন। ঘরে ঘরে সাধারণ মানুষ প্রার্থনার হাত তুলেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় কামনা করে। অনেক ক্ষেত্রে মা নিজেই সন্তানকে পাঠিয়েছেন অস্ত্র হাতে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য। পাকিস্তানিদের নির্যাতন-নিপীড়ন যতো তীব্র হয়েছে, বাঙালির প্রতিরোধী চেতনা ততো শক্তিশালী হয়েছে। এ চেতনার সামনে পাকিস্তানিদের আধুনিক অস্ত্র আর গোলাবারুদ কোনো কাজে আসেনি।

নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন এক দেশ পেলাম বটে, কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারের দুঃশাসন ও দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতা বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্নকে ম্লান করে দিলো। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনায় এই ব্যর্থতা সদ্য স্বাধীন দেশটিকে নিপতিত করল অন্ধকারে। এ সময় যেখানে প্রয়োজন ছিল উন্নয়নমুখী মানবতাবাদী নেতৃত্ব, সেখানে আমরা পেলাম মানবতাবিরোধী, অগণতান্ত্রিক এক শাসন। হাজার হাজার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হলো। দেশের অবকাঠামো খাতে কোনো উন্নয়ন ঘটানো হলো না।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ডিএফপি নং. ০২/১৫.১২.২০২৫ আয়তন: ২০x২x৮=৩২০

অবাধ উচ্চারণের জন্যে আত্মত্যাগ

রেজাউদ্দিন স্টালিন

প্রথম শর্ত হলো অবাধ এক উচ্চারণের জন্যে আত্মত্যাগ
'স্বাধীনতা' এই ধ্বনি যা জিহ্বার আন্দোলন থেকে
সংক্রমিত হতে থাকে সমুদ্রস্বরের মতো গ্রাম এবং শহরে
কিন্তু ক্রমাগত রক্তচোখের দেয়ালে বাঁধা পেতে থাকে সেই উচ্চারণ
একুশ শতকেও কারাগার হয়ে ওঠে প্রবন্ধকদের গবেষণাগার
আর বছরগুলো গড়িয়ে যায় আমার প্রতিরোধপ্রবণ বাহুর মধ্যে
আর হাজার হাজার নক্ষত্রের মতো সম্পাদিত হতে থাকে
আমার দিনপঞ্জীর প্রকাশনা-

যেখানে মৌমাছির গুঞ্জরণ আর ধানশীষের সংবাদ ও বিরল নয়
বিরল নয় নদীর কল্লোল এবং গাঙচিলের চিৎকার, কুয়াশা ভেজা
কৃষকের পায়ের শব্দ, বন্দী পিতার জন্যে অপেক্ষাতুর শিশুর
চোখের জলের নিরবচ্ছিন্ন নদী, সম্রাটদের পলায়ন, মুদি দোকানীর
হাঁক ডাক কিংবা শেয়ার বাজারের ওঠা নামাও

দ্বিতীয় শর্ত হলো বিজয় সাফল্যে ভরা সৌন্দর্যের আন্দোলন
সৌন্দর্য অর্থাৎ বসন্তের উৎসর্গ পত্রে লেখা ভালোবাসা-
যারা ফিরে এসেছে প্রতিশোধ নেবার দায় থেকে- মুক্তিযুদ্ধের
ওয়াগনে চড়ে তারা এশিয়ার উপকূলে সূর্যাস্তের জলন্ত কয়লার
সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করুক গুপ্ত শিকারীর সতর্কতা
দেখুক অন্ধকারে বন বেড়ালের চোখের আগুন অথবা পাঠ করুক
ক্ষার তুষারের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত আমার কবিতা

তৃতীয় শর্ত হলো খুব এক শপথের হীরে বসানো মুকুট খুঁজতে
বেরিয়ে পড়া; সোনালী লতার চুমকি বসানো পথে ট্রাফিক খরগোশের
সিগন্যাল সরিয়ে কাঠবিড়ালীর মতো গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে
অনুসন্ধান- আর তার জন্যে চাই তিতুমীর কিংবা ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ
যাদের স্বচ্ছতোয়া চোখের ভেতর সমগ্র বাংলাদেশ স্নান সেরে শুদ্ধ হতে পারে
সত্যিকার অর্থে তৃতীয় শর্তই হলো জরদগব উত্তরাধিকার
জলন্ত জেরেনিয়ামের মতো উজ্জল সারাৎসার, তামা দস্তা রুপো
আর ইস্পাতের পাতে তৈরী
ফুসফুসের মৌচাক ঘিরে আবর্তিত শর্ত সমূহ একবার বিশেষ্যে
এবং আরেকবার বিশেষণে রূপবদল করেই আমাদের পথ পেরোতে হবে
প্রস্তুতি নিতে হবে পিঁপড়ের নিঃশব্দ যাত্রার মতো, আমার বিশ্বাস
সোনা বাঁধানো মুকুটটি পাওয়া যাবে কোনো উইঢিবি
অথবা ইঁদুরের গর্তের মধ্যে এবং তখন সময় থাকবে
আশ্চর্য গোলাপী ঋতু- বসন্ত

মুক্তিযুদ্ধের গল্প ও বাংলাদেশের জনসমাজ

নিয়ন্ত্রণও করছে। কেউ আছেন নিজের রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে; কেউ আবার অস্তিত্বসংকটকেই একমাত্র ধ্রুব ধরে নিয়ে মরার আগেই মরছে, কিংবা মৃত্যুর কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জীবনের বিরাট আয়োজনে। যেকোনো পরিস্থিতিতেই তৈরি হচ্ছে গল্প। সে গল্প এক হয়ে দশের কাছে যাচ্ছে। মিলছে পরস্পরের সাথে। তৈরি হচ্ছে যৌগ গল্প। তৈরি হচ্ছে মিথ। কিংবদন্তি।

যদি এ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক বাস্তবতার অংশ না হয়েও কোনো যুদ্ধ এসে পড়তো এ দেশের মানুষের উপরে, তাহলেও আলবত গল্প তৈরি হতো। প্রথম বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেমন হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ মোটেই সেরকম কোনো ব্যাপার ছিল না। এ ছিল সামষ্টিকভাবে সব মানুষের জন্য অস্তিত্বের গহীনে লিপ্ত এক বাস্তবতা। আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই ঘটনাটা ঘটেছিল বলে এর সর্বব্যাপীতা ছিল অনেক বেশি। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব বাংলার মানুষের যুদ্ধ, যে পূর্ব বাংলার সীমানা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। সাতচল্লিশেও এ অঞ্চলের মানুষ লড়াই করেছে। প্রায় পূর্ব বাংলার মানুষ হিসেবেই। কিন্তু ওই লড়াইয়ে তার যে রাষ্ট্রসীমা তৈরি হলো, তাতে গল্পের ঐক্য ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার মানুষ খুব সামান্য পরিমাণে গল্প ভাগাভাগি করত। এত কম গল্প নিয়ে জনসমাজ হয় না। অভিজ্ঞতার এত কম সাযুজ্য নিয়ে সামষ্টিক গল্প দাঁড়ায় না। কিন্তু তা তো রাষ্ট্রের ব্যাপার। রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতার বাইরেও জনসমাজের গল্পের আলাদা স্তর থাকে। সেখানে পূর্ব বাংলার মানুষ আগের শত শত বছরের লড়াই আর মুক্তি-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য বিস্তর সামষ্টিক গল্পের রসদ জমিয়েছিল।

ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াইয়ের কালে তার ভিন্ন গল্প ছিল। একেবারেই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বাস্তবতা আর অস্তিত্বের বিচিত্র আয়োজনের কোল ঘেঁষে তার জন্য ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াইয়ের এমন সব মাত্রা জড়ো হয়েছিল, যেগুলোর সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের কোনো মিল ছিল না। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের থেকেও সে নিজের অস্তিত্বকে আলাদা করতে পারতো। সে ওই গল্পের আয়োজনেই। এখানে যখন কৃষক আন্দোলনগুলো হচ্ছিল নানা নাম আর মতাদর্শের ছত্রছায়ে, তখন তার সাথে উত্তর কিংবা পশ্চিম ভারত তো বটেই, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতার কি কোনো মিল ছিল? আদতে ওই দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের খুব সামান্য গল্পই পশ্চিমবঙ্গের সাথে মেলে। উনিশশ তিরিশের দশকে এ অঞ্চলের মানুষ কী চমৎকার গল্পের মালিক বনেছিল কৃষক-প্রজার নামে। এ গল্প অতুলনীয়। এ তার নিজেরই গল্প। আর সে গল্পকে সে যখন নিজের বাস্তবতার দুনিয়াবি প্রয়োজনেই বদলে নিয়েছিল মুসলিম লিগের সাথে, তখনো নিখিল ভারতীয় মুসলমানি রাজনীতির সাথে তার কী বিস্তর তফাত! গল্পগুলো আলাদা ছিল বলেই না সাতচল্লিশের অব্যবহিত পরেই রাজনীতির খাত এতটা বদলে গেল। কাউকে বলে দিতে হয়নি। এমনই হয়। যে গল্প অস্তিত্বের ভিতর থেকে আসে, সে গল্পই জোগান দেয় পরবর্তী গল্পের প্রবাহ।

ওই দীর্ঘকালের নিজস্ব গল্পের সঞ্চয়ের মধ্যেই মানুষ একাত্তরে মুখোমুখি হয়েছিল নতুন গল্পের। কাজেই সে গল্পের পরতে পরতে জমা হয়েছে তার দীর্ঘ গল্পের রসদ। তার নতুন মূর্তিতে পরিষ্কার ছাপ রেখে গেছে আগের দশকগুলোকে জমা হওয়া বিচিত্র গল্পের নাম ও নিশানা।

আমাদের ইতিহাসকারগণ নিশ্চয়ই নানাভাবে সেসব গল্পের শৃঙ্খলা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হয়, তাঁদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের গল্পে আগের গল্পের দীর্ঘ সিলসিলার হদিস নিতে পারেননি। বরনকি সে হদিস যে খুব জরুরি, তার খোঁজও পাননি। অনেকে মতাদর্শিক নির্মাণকে জনজীবনের পরতে পরতে জমে থাকা অভিজ্ঞতা আর গল্পের উপরে স্থান দিতে গিয়ে নষ্ট করেছেন গল্পের বহুস্তর তাৎপর্য। কেউ কেউ আবার একেবারে চোখের সামনে ঘটে যাওয়া তাজা গল্পের পসরাকে অপ্রমাণ করে উল্টে দিতে চেয়েছেন, যেনবা এরকম কিছু ঘটেনি। লক্ষণ দেখে মনে হয়, যে গল্প ব্যাপ্ত হয়ে আছে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর মর্মদেশ ঘিরে, সে গল্পকে কেবলই ক্ষমতা আর রাষ্ট্রকাঠামোতে অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক গল্প-বলিয়ে হারিয়েছেন গল্পের মর্মস্থান। জনজীবনে বিকীর্ণ হয়ে থাকা উপাদানগুলোকে আলগা করে নিয়ে নিজের মাপমতো ছাঁচ বানাতে চাইলে কী আর মর্মের হদিস পাওয়া যাবে?

ইতিহাস আর রাজনীতির গল্পের এ ছন্নছাড়া দশার মধ্যে সাহিত্যশিল্পের অবস্থা বোধহয় খানিকটা ভালো। শিল্পকলা তো গল্প বলে। মানুষের গল্প বলে। সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তি-মানুষকে চালিয়ে দেয়। প্রাকৃতিক আর মনুষ্য-নির্মিত অবকাঠামোর মধ্যে সমষ্টির পরিসরে স্থাপন করে ব্যক্তিকে। এ ধরনটা জনসমাজে ব্যাপ্ত গল্পের ঢঙের অনেক কাছাকাছি। কাজেই আমাদের গল্পকার, ঔপন্যাসিক কিংবা সিনেমাওয়ালারা যখন গল্প বলেছেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, তখন জনজীবনের গল্প হয়তো অনেক বেশি সাফল্যের সাথে উঠে এসেছে সেসব শিল্পকলায়। কিন্তু কোথায় যেন বেশ বড়ো এক গলতি রয়ে গেছে। ইতিহাসের গল্পগুলো যে কারণে একটা ছোটো পরিসরের বাইরে প্রসারিত হতে পারেনি, ইতিহাসের গল্প যেসব কারণে ছুঁতে পারেনি জনজীবনে ব্যাপ্ত গল্পের বিচিত্র পরিসর, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শিল্পকলাও অনেকটা যেন সেসব কারণেই সাফল্যের মুখ দেখেছে অনেক কম। মতাদর্শিক আয়োজনের বাড়াবাড়ি দেখা গেছে শিল্পকলায়ও। তবে ব্যক্তির গল্পে অন্তরঙ্গভাবে প্রবেশ করতে না পারাই বোধহয় মুক্তিযুদ্ধের গল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের শিল্পকলার প্রধান সীমাবদ্ধতা সূচিত হয়েছে। কথাটা খানিকটা বিশদ করা জরুরি।

গল্প তখনই আকর্ষণীয় হয়, যখন তাতে ব্যক্তির ব্যক্তিতা ডানা মেলার অবকাশ পায়। আলাদা ব্যক্তি বলে তো আর কিছু নাই। কাজেই ব্যক্তিকে আমরা গল্পের অবয়বে সবসময় সমষ্টির সাথে বিচ্ছেদ-অন্বেষণ জৈব সম্পর্কেই দেখতে পাব। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ওই কাঠামোর মধ্যে, সামষ্টিক মানুষের ঐকতানের মধ্যেই ব্যক্তিরা হাজির হন এমন মাত্রায়, যেন ব্যক্তি-ভোক্তা নিজের একটা সমান্তরলতা আবিষ্কার করতে পারেন। এ দিকটাকে কম গুরুত্ব দিয়ে যদি শিল্পকলায় কেবলই বড়ো আকারটা প্রাধান্য পেতে থাকে, যদি কেবলই মতাদর্শিক ছাঁচ মানুষ বা মানুষদের গল্পে অনড়-অচল পাথর হয়ে চেপে বসতে থাকে, তাহলে গল্পই বা থাকে কোথায়, আর শিল্পকলাই বা কীভাবে জমে। একক ঘটনা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়েই রচিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি শিল্পকলা। স্বভাবতই। এরকম অভিজ্ঞতার, তাও আবার অস্তিত্বের রক্তে অবগাহন করা অভিজ্ঞতার জোগান আর কোথায়ই বা পাওয়া যাবে? অনেকেই বলে থাকেন, মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এতটাই নিকটবর্তী আর বাস্তব যাপনের সমীপবর্তী যে, নিরাসক্তির জন্য প্রয়োজনীয় দূরত্বের অবকাশ এখনো ঘটে নাই। সে কথা সত্য হতেও পারে। কিন্তু মতাদর্শিক ঝোঁক এবং সমস্ত আয়োজনকে মুক্তিযুদ্ধসমগ্র করে তোলার অর্বাচীন খায়েশে যে ব্যর্থতার একটা বড়ো কারণ, তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

অথচ কী অসীম গল্পের ভাড়ার আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। তাতে রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। পক্ষবিপক্ষের নানা খতিয়ান থাকতে পারে। ক্ষমতাবানদের ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত প্রতারণার অসংখ্য ঘটনা থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু জনজীবনের নিত্য ও নৈমিত্তিক স্তরে যে গভীর-ব্যাপক ভূমিকা হয় মুক্তিযুদ্ধ জন্ম দিয়েছিল অসংখ্য ব্যক্তিক আর সামষ্টিক গল্পগাথা, পরিমেয় বা অপরিমেয় অনুভূতির বহুবর্ণ, মৌলিক বা যৌগিক অসংখ্য অভিজ্ঞতার কথিত-অকথিত বয়ান, তা তো মিথ্যা হয়ে যায় না। মুক্তিযুদ্ধ নিঃসীম ভয়ের সময়, একইসাথে অসম বীরত্বের গৌরবগাথা। মুক্তিযুদ্ধ অস্তিত্বের বহুবর্ণ পরীক্ষার এক অমীমাংসেয় ল্যাবরেটরি। মুক্তিযুদ্ধ এক সর্বাত্মক জনযুদ্ধ।

বহু মানুষের জন্য এ যুদ্ধ এক আচানক জুড়ে বসা ঘটনা। অস্তিত্বের গহীন-গভীর পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে সে যুদ্ধ থেকে আবিষ্কার করেছে মুক্তিযুদ্ধ। বহু মানুষের জন্য মুক্তিযুদ্ধ তার আকাঙ্ক্ষার অনিবার্য প্রকাশ। হয়ত বাস্তবের অসংখ্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার সে আকাঙ্ক্ষা পর্যবসিত হয়েছে সীমাহীন তিক্ততায়। বহু মানুষের নিজের গল্প যুক্ত হয়েছে অন্যদের মর্মচেঁড়া অভিজ্ঞতার সাথে। সে মিলেছে, কিংবা জড়িয়েছে রক্তাক্ত বিরোধে। অল্প সময় নয় যে বহু মানুষ বেরিয়েছে যুদ্ধের ময়দানে। হয়ত শেষ পর্যন্ত ময়দানের সাক্ষাৎই মেলেনি। এ এমন এক অভিজ্ঞতা যা এ ভূখণ্ডের কোনো মানুষকেই স্পর্শ না করে যায়নি। অনবরত বদলেছে পক্ষ-বিপক্ষের ব্যাকরণ। অনবরত মানুষ চিনেছে নিজ ও অপরের স্বরূপ। এরকম সর্বব্যাপী গল্পের পসরা সব জনগোষ্ঠীর জীবনে ঘটে না।

এ ধরনের সর্বাত্মক গল্পের জোগানকে দুনিয়ার বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী নিজেদের গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করে। জনজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে কাঠামোগত সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণেই এ কাজ করা সম্ভবপর হয়। বাণী নয়, কথা নয়, মানুষকে সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে স্পর্শ করে গল্প। গল্পের সর্বজনীনতা তাকে অতি দ্রুত একাত্ম করে। কাজেই যে বস্তুকে আমরা জাতিগঠন বলি, যে প্রক্রিয়াকে আমরা রাজনীতি বা রাষ্ট্রগঠন বলি, তার জন্য এরকম এক সর্বজনীন গল্পের ভাঁড়ার অতি উত্তম মওকা। আমাদের জন্য একটা দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হলো, আমাদের এরকম অসাধারণ গল্পভাণ্ডার থাকার পরেও আমরা জনসমাজ গড়ার কাজে একে ব্যবহার করতে পারি নাই।

না পারার কারণকে এভাবে হয়তো ব্যাখ্যা করা যায় যে, ইতিহাস বা শিল্পকলা বা রাজনীতিতে আমরা মুক্তিযুদ্ধের যে অংশ যেভাবে ব্যবহার করেছি, তাকেই সম্পূর্ণ অংশ বলে দাবি করেছি। কোনো মতাদর্শিক লড়াই বা মতাদর্শ-নির্ভর দলের সুসংগঠিত কর্মকাণ্ডকে হয়তো খানিকটা সীমিত পরিসরে এরকম সম্পূর্ণতার দাবি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু যে ঘটনা বা কর্মকাণ্ড কোটি কোটি মানুষের সাথে যুক্ত, যেখানে কোটি কোটি মানুষ যুক্ত হয়েছে ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে, তাকে পক্ষ-বিপক্ষের বিভ্রমে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? পক্ষ-বিপক্ষ নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ একইসাথে রাজনৈতিক ঘটনা; কিন্তু পক্ষ-বিপক্ষের আংশিক ছাঁচে সম্পূর্ণকে পাওয়ার যে দাবি আমাদের ইতিহাস, শিল্পকলা বা রাজনীতির কুললক্ষণ, তা তো মুক্তিযুদ্ধের বিপুল বিস্তারকে অস্বীকার করার নামান্তর। এমনকি এ কথাও উচ্চারিত থাকা উচিত যে, যারা মুক্তিযুদ্ধে বিচিত্রভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে, তাদের ভুলত্রুটি, কিংবা যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, তাদের অপরাধ কিংবা এ দুয়ের সমষ্টি- এর কোনোটাই মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এর সবকিছু মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গল্পের খুব সামান্য অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

এ উপলব্ধির অভাবটা আমাদের রাজনীতির জন্য বা রাষ্ট্রগঠনের জন্য শোচনীয় হয়েছে। গল্পের আধারে ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনকে আবিষ্কার করে ঐক্যের উপলব্ধি তৈরি করার যে অসামান্য সুযোগ আমাদের হাতে ছিল এবং আছে, তাকে রাষ্ট্রগঠনের কাজে ব্যবহার করতে না পারা জনগোষ্ঠী হিসেবে শোচনীয় অভিজ্ঞতাই বটে। এ জন্য আমাদের মনোবেদনা নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু এটা শেষ কথা নয়। এমনকি কোনো সিদ্ধান্তসূচক কথাও নয়।

যে ইতিহাস কাগজে-কলমে লেখা হয়, তার বাইরেও ইতিহাস থাকে। বলা উচিত, যা লেখায় ধরা পড়ে না, তা-ই হয়তো প্রকৃত ইতিহাস। শিল্পকলায় মানুষের যাপিত জীবনের গল্পের খুব ছোটো একাংশ মাত্র রূপ পায়। জনজীবনের জটিল গ্রন্থিগুলোতে গল্পগুলো যেভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে, তার তল্লাশি চালানো হয়তো শিল্পকলার পক্ষে অনেকসময় সম্ভবই হয় না। জনজীবনের গল্পগুলো কিন্তু থেকেই যায়। আর রাজনীতির কথা, বিশেষত দলীয় রাজনীতির কথা বললে তো বলতে হয়, অতি সংকীর্ণ আর স্বার্থচেতন ও উদ্দেশ্যপ্রবণ কিছু গল্প নিয়েই সাধারণত জীবনের এ অঙ্গনটা ক্রিয়া করে। অধিকাংশ সময় জনজীবনের গল্পকে অঙ্গীকার করার লক্ষ্যও তার থাকে না। কাজেই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিচিত্র ফর্মে যা বলা হয়েছে, এবং যা ভবিষ্যতে বলা হবে, তা আসলে সমগ্রের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাও আবার অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত।

প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ আছে জনজীবনে। আরো ভালো হয় বললে, জনজীবনের গল্পে। সে গল্প প্রভাবশালী বয়ানের চাপে হয়তো মাঝে-মধ্যেই দিশাহারা হয়। সে গল্প হয়তো নানা প্রত্যক্ষ বাস্তবের ইশারায় কোণঠাসা হয়ে নিজেকে আড়ালে নিয়ে যায়। কিন্তু জীবন দিয়ে পাওয়া বলেই তার কোনো ক্ষয় নাই। জীবনের সাথে আরোপণমূলক সম্পর্কের বাইরে তার নিগূঢ় আত্মীয়তা বলেই যেকোনো অনুকূল ক্ষণে তার সমস্ত আকুতি আর শক্তিমত্তা নিয়ে সে আবির্ভূত হতে পারে চলমান জীবনের সজীব ময়দানে। এ বিপুল বিকীর্ণ মুক্তিযুদ্ধই আমাদের সম্ভাবনা। যদি আমাদের বিদ্বৎসমাজ কখনো ইতিহাস বা শিল্পকলার উদার প্রাঙ্গণে জনজীবনের এ গল্পগুলোর সংস্থানে সামষ্টিকভাবে ব্রতী হতে পারে, যদি রাজনীতির প্রত্যক্ষতায় জনমানুষের মুক্তিযুদ্ধ যথাসম্ভব অধিক হারে অনূদিত হতে শুরু করে, তবেই আমরা বাংলাদেশে জনলিপ্ত রাষ্ট্রগঠনে অগ্রসর হতে পারব। সে শুধু আমাদের উন্নতির চিহ্ন হবে না, প্রধান নিয়ামকও হবে। বাংলাদেশের জনসমাজের মুক্তিযুদ্ধ গত চুয়ান্ন বছর ধরেই সে অন্তর্লীন সম্ভাবনা ধারণ করে আছে; আগামী দিনগুলোতে থাকবে। ❑

লেখক: অধ্যাপক (ডেপুটেশন), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

বিজয়ের গান

আবদুল হাই শিকদার

অশ্রু এবং রক্তের নদী এনেছিল সন্দেশ,
বিজয়ের গান বিজয় দিবস দৃপ্ত বাংলাদেশ।
বিজয়ের গান মাঠে ও গঞ্জে বিজয়ের গান বক্ষে,
সে বিজয় ছিল স্বাধীনতা আর শোষণমুক্তি লক্ষ্যে।

স্বাধীনতা এসে বরণীয় হলো, স্মরণীয় যন্ত্রণা,
এতোটা বছর পরেও উদরে ক্ষুধা আর বঞ্চনা।
এখনও রক্ত এখনও শক্ত দুঃশাসনের কর্ম,
সে ভূত তাড়াতে লাল ও সবুজে রাঙাও সকল মর্ম।

বিজয় আমার মুক্ত বাতাস খোলা জানালার মেঘ,
বিজয় আমার টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া উল্লেখ।
বিজয় আসুক সব ঘরে ঘরে বিজয় সবার বড়,
বিজয়কে কর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তীব্র ও খরতর।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বিজয় দিবসের প্রেরণা

মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে গলা টিপে হত্যা করার উদ্যোগ নেওয়া হলো। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে এদেশের দেখা দিলো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ভয়াবহতায় এ দুর্ভিক্ষ বাঙালির ইতিহাসের ভয়ংকরতম মন্বন্তরগুলোর সঙ্গে তুলনীয়। সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি এবং সরকারি অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা দুর্ভিক্ষের প্রকোপকে অনেকটাই বাড়িয়ে তোলে। মানুষ প্রবল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পায়, রাস্তায় যখন অনাহারে শিশুরা মৃত্যুবরণ করছে, বস্ত্রের অভাবে যখন হাতের কাছে যা পায় তা দিয়েই লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছে, শাসকদলের সদস্যরা সেখানে চরম বিলাসিতায় দিনাতিপাত করছে। তাদের কাছে সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের যেন কোনো মূল্যই নেই। শোষণ, নির্মমতা ও দুঃশাসনের এ চিত্র পরিস্থিতিকে ক্রমশ আরো দুঃসহ করে তোলে। ক্রমে দানা বেঁধে ওঠে নীরব বিদ্রোহ। ক্ষমতাসীন দল এ বিদ্রোহকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় একদলীয় দুঃশাসন। সরকারি নিয়ন্ত্রিত চারটি পত্রিকা ছাড়া বাকি সব পত্রিকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করে সারা দেশে একদলীয় আওয়ামী বাকশালী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় ঘটে ১৯৭৫ সালের রক্তাক্ত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন।

এ পরিবর্তন স্বাধীনতার মহান ঘোষক জিয়াউর রহমানকে এনে দেয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। সিপাহী জনতার সফল বিপ্লব তাঁকে আসীন করে রাষ্ট্রক্ষমতায়। ক্ষমতায় এসেই তিনি দেশে গণতন্ত্রের নতুন যাত্রা শুরু করেন। বিরোধী দল ও মতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন। সূচনা করেন উন্নয়নমুখী নতুন এক রাজনীতির, যে রাজনীতির কেন্দ্রে আছে দল মত নির্বিশেষে সব মানুষকে নিয়ে নতুন এক বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রাম। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা এক প্রশাসক। বাণিজ্যিক উদারীকরণ ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের নীতি অনুসরণ করেন। বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতির দুই শক্তিশালী ভিত্তি রেডিমেড গার্মেন্টস এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্স, দুটোরই সূচনা ঘটে তাঁর শাসনামলে। খাল কাটা কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনেন। দেশমাতৃকার এই মহান সন্তান যখন আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর ভবিষ্যৎমুখী নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় নেতৃত্বের আসনে আসীন করছেন তখনই ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর হয়ে ওঠে। বিপথগামী একদল সেনাসদস্যের হাতে মৃত্যু হয় তাঁর।

তারপর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দীর্ঘ স্বৈরশাসন শেষে নব্বই দশকের শুরুতে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পুনরায় বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনের সূচনা হয় বাংলাদেশে। নব্বই ও শূন্য দশক-উভয় দশকের প্রারম্ভেই বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ছিল। কেবল সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনই নয়, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা ও উন্নয়নমুখী নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশকে একটি মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয় এ সময়টাতে। কিন্তু ২০০৮-এর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে দেশে নেমে আসে একনায়কতান্ত্রিক দুঃশাসন। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের মহান সব অর্জনকে নস্যাৎ করে দেওয়ার মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত শুরু হয়। একের পর এক একতরফা ও ভুয়া ভোট আয়োজনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে পাঠানো হয় নির্বাসনে। স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনা ও তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে তৈরি করা হয় এক কাল্ট। এ কাল্টের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিপূজা। জনগণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে 'উন্নয়নের রাজনীতি' নামের এক বায়বীয় ধারণাকে সামনে রেখে স্বজনতোষণ, ব্যাংক লুটপাট, বিদেশে অর্থ পাচারসহ দুর্নীতির মহোৎসব শুরু হয়। সকল অন্যায় অত্যাচার, দুর্নীতি ও দুঃশাসনকে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র মোড়কে জনগণের সামনে হাজির করা হয়। দীর্ঘ এ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ করলেও নেমে এসেছে দুঃসহ নির্যাতন। এজন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি উপকরণকে ব্যবহার করা হয়েছে নির্বিচারে। বাংলাদেশের মানুষ পরিচিত হয় 'গুম' নামের ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের সাথে। প্রতিবাদী মানুষ, বিশেষ করে বিরোধী মতাদর্শের সমর্থনকারীরা গণহারে গুম হতে থাকেন। এদের বেশিরভাগেরই আর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। স্বৈরশাসনের পতনের পর মানুষ জানতে পারে, গুম হওয়া মানুষদের অনেককেই রাখা হতো 'আয়নাঘর' নামের এক কারাগারে, যেখান থেকে বেঁচে ফিরে আসা মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা।

২০১৪, ২০১৮, ২০২৪-একের পর এক একতরফা ও ভুয়া নির্বাচন করার মাধ্যমে মানুষের মত প্রকাশ ও বেছে নেওয়ার অধিকারকে কুক্ষীগত করা হয়। বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পেশীশক্তির প্রয়োগ আর মামলা-হামলা দিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়। কিন্তু কথায় আছে, রাত যতো গভীর হয় প্রভাত ততো নিকটে আসে। অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণের নিচেই ক্রমশ উদিত হচ্ছিল নতুন এক বিজয়ের সূর্য। ১৯৭১-এ পাকিস্তানি হানাদারদের দুঃসহ নির্যাতনের বিরুদ্ধে যেমন বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, ২০০৮-২০২৪-এর শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ায় এদেশের সাধারণ মানুষ। চাকরিতে মাত্রাতিরিক্ত কোটা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে মাঠে নামে প্রতিবাদী ছাত্র জনতা। অচিরেই দেখা যায়, এটি আর কেবল ছাত্রদের আন্দোলন নেই, দেড় দশক ধরে মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ এবার এসে মিশেছে স্বৈরাচারী হটানোর সংগ্রামী মোহনায়। যেন মুক্তিযুদ্ধের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলো আবার ফিরে এলো। আবার যেন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে শ্রেণি, পেশা, বয়স নির্বিশেষে সব মানুষ নেমে এলো রাস্তায়। স্বৈরাচারের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলোর মতোই তারা গেয়ে উঠল:

> বৈশাখের ওই রুদ্র ঝড়ে
> আকাশ যখন ভেঙে পড়ে
> ছেঁড়া পাল আরও ছিঁড়ে যায়
> হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায়
> হঠাৎ কে যে শঙ্খ শোনায়
> দেখি ঐ ভোরের পাখি গায়

অবশেষে জুলাই আগস্টের ৩৬ দিনের অবিস্মরণীয় এক গণজাগরণ ঘোষণা করল জনতার জয়। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ছাত্রজনতার প্রবল প্রতিরোধ যেভাবে পাকিস্তানি অপশাসনের কবর রচনা করেছিল, ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের আন্দোলনও ঘোষণা করল জনতার জয়। প্রমাণ করল, যে জাতি একাত্তরে জয়ী হয়েছে, চব্বিশের গণআন্দোলনেও জয় তাদেরই হবে। স্বৈরাচারের পতনের মুহূর্তটিতে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস তৈরি করল অসাধারণ সব মুহূর্ত। আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন বলেছিলেন, 'there is a certain enthusiasm in liberty, that makes human nature rise above itself, in acts of bravery and heriosm.' স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই জন্ম নিলো অসাধারণ সব বীর। রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করলেন শেক্সপিয়ারের সেই উক্তিকে: কাপুরুষ মৃত্যুর আগে অজস্রবার মরে, কিন্তু বীরেরা মৃত্যুর স্বাদ নেয় মাত্র একবার।' আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধ, ওয়াসিম আকরাম, ফারহান ফাইয়াজসহ অজস্র বীর যেন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের স্মৃতিকে আবার ফিরিয়ে আনলেন। সাধারণের মধ্যেই জন্ম হলো অসাধারণত্বের। স্বৈরাচারের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে তাঁরা রচনা করলেন নতুন ইতিহাস।

শেখ হসিনার দেড় দশকের স্বৈরশাসনের দিনগুলোতে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছিল একপক্ষীয় বয়ান। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যেকোনো উদ্যোগকে 'মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধিতা'র তকমা দিয়ে চালানো হতো নির্যাতনের স্টিমরোলার। জুলাই-আগস্টের গণআন্দোলন সেই বয়ান থেকে বের করে এনেছে বাংলাদেশকে। যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে কৃষক, মজুর, কুলি আর শ্রমিকেরা অস্ত্র তুলে নিয়েছিল হাতে, তাদের অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করার নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে এ অভ্যুত্থান। জুলাই গণজাগরণ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে পরিচালিত করার প্রেরণা জাগিয়েছে। যেকোনো মূল্যে এই প্রেরণাকে ধরে রাখতে হবে।

জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিজয় দিবসের নতুন শিক্ষা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনো নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ নয়। এটি সব মানুষের, সবার। মুক্তিযুদ্ধে যেমন অবদান ছিল সকল বাংলাদেশির, তেমনি বিজয়ের গৌরবও এদেশের সাধারণ মানুষের। উন্নয়নের রাজনীতি, চেতনার রাজনীতি ইত্যাদি মোড়কে কোনোভাবেই এদেশে পুনরায় স্বৈরশাসনের আবির্ভাব ঘটতে দেবে না বাংলাদেশের মানুষ। জুলাইয়ের শিক্ষা বুকে নিয়ে ভবিষ্যতের 'সব মানুষের বাংলাদেশ' গড়ার শপথ তাই আমাদের নিতে হবে এই বিজয় দিবসেই। ❑

লেখক: প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়